Reg. No. DA.—142

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

পুর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র

আগষ্ট, '৫৭ : ভাদ্র, ১৩৬৪

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৪৲ টাকা প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

ছাত্র ও বিশেষ প্রার্থীর জন্য ২৲ টাকা

পাক্ষিক আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হয়।
২। চাঁদা, সাহায্য (বা কাগজ পাওয়ার সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে) ম্যানেজারের নিকট পাঠাইতে হয়। চাঁদা অগ্রিম দেয়।
৩। 'আহ্‌মদীর' 'বৎসর' মে হইতে এপ্রিল এবং যিনি যখন গ্রাহক হন তখন হইতে।
৪। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। ম্যানেজারের সহিত পত্রালাপ করুন।

ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,
৪ নং বক্সীবাজার রোড, ঢাকা

নব পর্য্যায়—১১শ বর্ষ | Fortightly Ahmadi, August, 1957. | ৭ ও ৮ সংখ্যা

জুমার খোৎবা

"সর্ব্বাবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা মোমেনের কর্ত্তব্য। মাত্রাহীনতার উভয় পার্শ্বই মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর।"

—হজরত খলিফাতুল্-মসিহ্ সানী (আইয়েদাহুল্লাহু-তা'লা বেনাস্‌রেহিল্-আজীজ)

রাবওয়া, ১১।৭।৫৭ ইং

[দ্রুত লিখন বিভাগের দায়িত্বে মূল উর্দ্দু খোৎবা প্রকাশিত হয় ২৫-৭-৫৭ ইং তারিখের 'দৈনিক আল-ফজলে']

অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আন্‌ওয়ার

তাশাহ্‌হুদ, তাউজ ও সুরাহ ফাতেহা পাঠের পর বলেন :—

মানুষের সৃষ্টিকে আল্লাহতা'লা এমনিরূপে গঠিত করিয়াছেন যে সর্ব্বপ্রকার সীমাতিক্রম তাহার পক্ষে ক্ষতিকর। এমন কি নৈসর্গিক মৌসুমের আধিক্য বা স্বল্পতাও তাহার ক্ষতি করে। অধিক গরম পড়িলে তাহাতেও স্বাস্থ্য হানি ঘটে। আবার অধিক শীত হইলেও স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেরও একই অবস্থা। কোরআন করীমের এক স্থানে আল্লাহতা'লা অর্থ নীতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে যাইয়া বলেন, যদি তোমরা তোমাদের হাত স্কন্ধের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখ অর্থাৎ কার্পণ্য কর তবে ইহাও খারাপ। আর যদি তোমরা উহাকে একেবারে খুলিয়া দাও অর্থাৎ সীমার অতিরিক্ত খরচ কর তবে তাহাও খারাপ। (বনি ইস্রাইল, রুকু ৩) প্রকৃত কথা হইল তোমরা মধ্য পন্থা অবলম্বন করিবে এবং সঠিক উপায়ে তোমাদের অর্থ ব্যয় করিবে। তাহাতে কৃপণতাও থাকিতে নাই এবং অতি ব্যয়ও থাকিতে নাই। সাদকা ও খয়রাত বাহ্যতঃ কত উচ্চ পর্য্যায়ের সৎকার্য্য। তাহাতেও ইসলাম এই শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছে। হাদিস সমূহে পাওয়া যায় একজন সাহাবী অন্তিম শয্যায় রসুল করীম (দঃ)কে আনাইয়া বলিলেন, হে আল্লার রসুল আমি আমার সাকুল্য ধন সম্পত্তি সদকা করিতে চাই।" তিনি বলিলেন, "ইহা খোদাতা'লা পছন্দ করেন না। কারণ, ইহার ফলে তোমার মৃত্যুর পর তোমার স্ত্রী পুত্র অন্যের নিকট হাত পাতা আরম্ভ করিবে।" সাহাবী বলিলেন, "ইয়া রসুলুল্লাহ, তবে আমি দুই তৃতীয়াংশ অসিয়ত করিতেছি।" তিনি বলিলেন, "ইহাও অনেক।" সাহাবী বলিলেন, "হে আল্লার রছুল, তবে আমাকে অর্দ্ধেক সম্পত্তি অছিয়ত করার অনুমতি দিন।" তিনি (সাঃ) বলিলেন, "ইহাও অনেক।" সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আল্লার রছুল, তবে আমি কতখানি অসিয়ত করিব?" তিনি (সাঃ) বলিলেন, "তুমি এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত কর এবং দুই তৃতীয়াংশ তোমার উত্তরাধিকারীদের জন্য রাখিয়া দাও।

দান-খয়রাতে মধ্য-পন্থা :

বস্তুতঃ, দান খয়রাত একটি অতি বড় নেকী। ইহাতেও ইসলাম মধ্য পন্থা অবলম্বনের হেদায়েত দিয়াছে। সম্পূর্ণ অর্থ দানের অনুমতি দেয় নাই। অবশ্য যদি কেহ তাহার জীবদ্দশায় হেবা করিতে চায়, করিতে পারে। কারণ হেবার ফলে সে নিজেও কষ্ট ভোগ করিবে। দৃষ্টান্তস্থলে যাহার বাৎসরিক আয় এক লক্ষ টাকা, সে তাহার এই আয় হেবা করিতে চাহিলে করিতে পারে। কারণ ইহার দ্বারা সে নিজেকেও কষ্টে নিপতিত করে। হেবার পূর্ব্বে আট হাজার, কি চারি হাজার বা তিন হাজার টাকা মাসিক ব্যয়ে সে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ করিত! হেবার ফলে সে নিজেকেও এই আয় হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। সুতরাং হেবার কথা স্বতন্ত্র। ইসলাম ইহাকে জায়েজ রাখিয়াছে। কারণ হেবাতে মানুষ তাহার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকেই বঞ্চিত করে না, বরং ইহা দ্বারা সে নিজেকেও ইহার উপকার হইতে বঞ্চিত করে। যদি কেহ স্বেচ্ছায় কুরবানী করিতে প্রস্তুত হয়, তবে শরীয়ত তাহার কুরবানীর স্পৃহায় বাধা জন্মায় না। কিন্তু যদি সে তাহার জীবন কালে এক লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয় তাহার নিজের জন্য খরচ করিতেছিল এবং মৃত্যুর সময়ে চাহিল তাহার সাকুল্য সম্পত্তি খোদার পথে দিয়া দিবে, উহার অর্থ ইহাই যে সে তো সম্পূর্ণ টাকা ব্যবহার করিতেছিল কিন্তু মৃত্যুর সময় চাহিল যে তাহার স্ত্রী পুত্র ও অন্য আত্মীয় যে ভাবে পারে জীবিকা নির্ব্বাহ করুক, তাহাদের জন্য কোন টাকা পয়সা বাকী না থাকুক।

সুতরাং রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম বলিয়াছেন, যে মৃত্যুকালে কেহ কেবলমাত্র এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করিতে পারে। অর্থাৎ কাহারও এক লক্ষ টাকা আয় থাকিলে সে এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ তেত্রিশ হাজার টাকার অসিয়ত করিতে পারে। অবশ্য, যদি জীবন কালে তাহা হেবা চায়, করিতে পারে। কারণ তাহার কার্য্যের দ্বারা ইহাই প্রমাণ করে যে সে নিজেকেও কষ্টে ফেলিতে প্রস্তুত। যে ব্যক্তি নিজেকে কষ্টে নিপতিত করিতে প্রস্তুত, তাহার অধিকার আছে যে সে তাহার স্ত্রী পুত্রকেও ঐ প্রকার অবস্থার ভিতর দিয়া গমন করিতে দেয়।

বস্তুতঃ, মধ্য-পন্থা সর্ব্বাবস্থায় জরুরী। দৈহিক ব্যাপারেও এই নীতিই প্রযোজ্য। চারিত্রিক বিষয়েও ইহাই নীতি এবং আধ্যাত্মিক বিষয়েও ইহাই প্রযোজ্য। যাহা হউক, একজন মোমেনের পক্ষে সর্ব্বাবস্থায় মিতব্যয়িতাকে স্মরণ রাখিতে হইবে। ধন সম্পত্তির অধিকারী হইলেই সে তাহার অর্থ সীমাতিরিক্তভাবে ব্যয় করিবার অধিকার তাহার নাই। সেইরূপ ব্যয়-কুণ্ঠও তাহার হইতে নাই।

নামাজে মধ্য-পন্থা :

সেইরূপ সীমার বাহিরে নামাজও পড়িতে নাই। এবং নামাজকে একেবারে ছাড়িতেও নাই। একবার রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম গৃহে যাইয়া দেখিতে পাইলেন একটি দড়ি ঝুলিতেছে।

তিনি হজরত জয়নবকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন যে উহা কিছের দড়ি? হজরত জয়নব (রাঃ) তাঁহার স্ত্রী ছিলেন এবং অত্যন্ত সংসার বিরাগী ও এবাদত গোজার ছিলেন। তিনি বলিলেন, হে আল্লার রছুল নামাজ পড়িতে পড়িতে আমার তন্দ্রা হইলে ইহার সাহায্য নেই।" তিনি (সাঃ) বলিলেন, "ইহা নামাও। ইহা কোন এবাদত নয়। এবাদত ঐ সীমা পর্য্যন্তই করিতে হইবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত মন প্রফুল্ল থাকে। তন্দ্রা আসিলে মনে করিবে এখন খোদাতা'লা ইহাই নির্দ্দেশ করিতেছেন যে এখন নামাজ ছাড়। দড়িটি নামাইয়া ফেল এবং ভবিষ্যতে ততক্ষণই নামাজ পড়িবে, যতক্ষণ তোমার দেহ তাহা সহ্য করিতে পারে।"

রোজায় মধ্য-পন্থা :

সেইরূপ দেখ, রোজা কত উচ্চ শ্রেণীর নেকী। কিন্তু রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম বলেন যে, ঈদের দিন যে ব্যক্তি রোজা রাখে, সে শয়তান। সেইরূপ তিনি বলিয়াছেন যে, জুমার দিনকে বিশেষভাবে নির্ব্বাচন করিয়া রোজা থাকিবে না। অন্য কথায়, নামাজকেও সর্ত্ত রাখিয়াছেন, রোজাতেও সর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। জেকরে এলাহীতেও সর্ত্ত রাখিয়াছেন। সকল কাজেই নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে মধ্য-পন্থা অবলম্বন কর।

হজরত শাহ্ অলিউল্লাহ্ সাহেবের ভগ্নি :

হজরত শাহ্ অলিউল্লাহ্ শাহ্ সাহেবের এক সহোদরা বেশী পরিমাণে জেকরে এলাহী (বা আল্লার নামের জপ) করিতেন। একদিন শাহ্ সাহেব তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। ভগ্নি বলিলেন, ভাই, ভাল কথা, আপনি আসিয়াছেন। আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।" তিনি বলিলেন, "কি কথা? ভগ্নি বলিলেন, নামাজ পড়িবার সময় নামাজে আমি তেমন স্বাদ পাই না যেমন জেকার এলাহীতে পাইয়া থাকি। ভ্রাতা বলিলেন, "বোন, দোজখের দিকে ইহা প্রথম পদক্ষেপ। শীঘ্র তুমি নিজের সংশোধন না করিলে শয়তান দ্বিতীয় পদক্ষেপে তোমাকে এই বলিয়া প্রবঞ্চনা করিতে চাহিবে যে নফল নামাজে ফরজ অপেক্ষা অধিক স্বাদ আছে। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে তোমার ফরজ নামাজও যাইবে।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার ভগ্নিকে "লাহাওল" পড়িবার জন্য তাকিদ করিলেন যাহাতে শয়তানী ওস্ওসা দূরীভূত হয়।

একদিন তাঁহার ভগ্নি আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ভাই, আপনার কথা সম্পূর্ণ সত্য ফলিয়াছে। একদিন আমি অজিফা আরম্ভ করিলে স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম শয়তান বানরের আকৃতিতে আমার সম্মুখে বসিয়াছে এবং আমাকে বলিতেছে, 'প্রথম পদক্ষেপে আমার উদ্দেশ্য ছিল তোমাকে 'জেকরে-এলাহীতে মশগুল রাখিয়া নামাজে তোমাকে শিথিল করিব। নামাজে তোমাকে শিথিল করিবার পর দ্বিতীয় পদক্ষেপের দ্বারা তোমার ফরজ নামাজ ছাড়াইব। কিন্তু তোমার ভ্রাতা বড় চালাক। তিনি তোমাকে

প্রগতি ও সমাজ

—মোহাম্মদ নূরউল আলম

অধিকতর উন্নত জীবন যাপন করার জন্য যেদিন থেকে আদম সন্তান বিচ্ছিন্ন ও জংলী জীবন ছেড়ে ঘরের আশ্রয় নিল, সেদিন থেকে শিক্ষার প্রয়োজন হয়েছে বলা যেতে পারে। শিক্ষা শব্দের অর্থ হলো—জানা। অজানাকে জানতে গিয়ে অচেনাকে চিনতে গিয়ে সে তার নিজের মাঝেও অনেক শক্তি ও রহস্যের খবর পেয়েছে। তাই যে ধর্ম্মে শিক্ষার তাগিদ নেই সে ধর্ম্ম তার পিপাসা মিটাতে পারে না। ইসলাম শিক্ষার দিকে খুব জোর দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর জন্য ফরজ করেছে। তারা যেন জ্ঞানের সাহায্যে চালিত হতে পারে, অধিকতর উন্নত জীবন যাপন করতে পারে, ন্যায় অন্যায় বিচার করতে পারে।

বিচ্ছিন্ন জংলী জীবন হতে আদম সন্তানকে উন্নত জীবন যাপন প্রণালী শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহতা'লা হজরত আদমকে (দঃ) খলিফা নিযুক্ত ক'রে পাঠান। তিনি এসে তাদের উন্নত ধরণের জীবন যাপন প্রণালী শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। এখন প্রশ্ন হতে পারে উন্নতি বলতে কি বুঝায়? উন্নতি শব্দের অর্থ হলো অধঃগতির বিপরীত। একটা অনুন্নত অবস্থা হতে উচ্চ স্তরে পৌছার নামই উন্নতি। যুগে যুগে আল্লাহতা'লা আদম সন্তানের জন্য এমনি করে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষক পাঠিয়েছেন। একজন শিক্ষককে কেন্দ্র করেই শিক্ষা শুরু হয়েছে। ক্রমে ক্রমে শিক্ষার দ্বারা উলঙ্গ অসভ্য জাতি সভ্য হয়ে উঠেছে। দিন দিন ক্রমোন্নতির নেশায় আদম সন্তান পাগল হয়ে উঠেছে। এমনি করে দিন দিন মানুষের বুদ্ধি বিবেচনা ও অন্যান্য শক্তি সমূহের বিকাশ ঘটেছে। তারা প্রাচীনদের তুলনায় অধিকতর সভ্য ও উন্নত বলে অহংকার করছে। কিন্তু মানুষের চিন্তাশক্তি বুদ্ধি বিবেচনা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে না রাখতে পারলে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে নিম্ন দিকেই চলতে থাকবে। ইহাও ভাববার বিষয়।

নারী পুরুষ সকলের জন্যই শিক্ষা অপরিহার্য্য। শিক্ষা যেমন মানুষকে উন্নতির দিকে আগাইয়া দেয়, নীতিহীন শিক্ষা তেমনি অবনতির দিকে চালিত করে।

আমাদের রাষ্ট্র ইসলাম পন্থী। কিন্তু এখানে ইসলামী শিক্ষার তেমন কিছুই নেই। ইসলামের প্রতি যেন সহমর্মার দৃষ্টি। স্কুল কলেজে যেন কি বাদ পড়ে যাচ্ছে। তা, না হলে সাধু পড়োয়ারা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে অসাধুতা অবলম্বন করতে পারে না। সাধুবাদের কোন কথা নেই—অফিসে উৎকোচ গ্রহণের কথা শুনা যায়, ব্যবসা-বাণিজ্যেও কাল বাজার, অতি লাভের রাজত্ব।

আবার অপর দিকে জ্ঞান বিজ্ঞান প্রসারের সাথে সাথে মানুষের বাহ্যিক বাধা বিপত্তিও সহজ হয়ে আসছে। নারীরা পূর্ব্ব যুগে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা না পেলেও এ যুগে তারা তা বেশ পাচ্ছে। পুরুষদের সাথে নারীরাও পেয়েছে পড়াশুনার অধিকার, খেলাধূলার অধিকার, বাজারে সওদা কিনবার অধিকার, সিনেমা হলে ও ক্লাব গৃহে যাওয়ার যোগ্যতা।

মুসলমান রাষ্ট্র মুসলিম দেশ ও মুসলিম সমাজের এ দুরবস্থা কেন তা ভাবতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে শিক্ষার গলদ। পাশ্চাত্য ভাবধারা ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় ডুবে গিয়ে নিজেদের ঐতিহ্যকে ভুলে গেছে। মহানবী যে সভ্যতাকে পৃথিবী হতে দূর করবার জন্য আবির্ভাব হয়েছিল মুসলমান জাতি নিজেদের বৈশিষ্টকে হারিয়ে সেই উলঙ্গ সভ্যতাকেই জড়িয়ে ধরল।

ইসলাম কোন কিছুতে অযথা অসুবিধা সৃষ্টি করে নি। ইসলাম নারীকে পিঞ্জিরাবদ্ধ করে রাখতে বলেনি। তাই যদি হতো বিবি আয়েশা (রাঃ) কি করে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলেন! ইসলাম নারীদিগকে শিক্ষালাভ করতে বারণ করেনি, তাই যদি হতো বিবি আয়েশার নিকট হতে তত্ত্বমূলক কাহিনী জানা যেতো না। তাই বলে ইসলাম বলে না পর স্ত্রী হয়ে পর পুরুষের সাথে হাত মিলাতে। নৈশ ভ্রমণে বের হতে বা সিনেমায় যেতে। ইসলাম নারী পুরুষ উভয়কে স্বাধীনতা দিয়েছে। বিবাহে সম্মতি দেওয়ার অধিকার যেমন পুরুষের আছে—নারীরও আছে। পুরুষ যেমন নারীকে তালাক দিতে পারে নারীও পুরুষকে আইনের আশ্রয় নিয়ে তালাক দিতে পারে।

পুরুষের কাজ বাইরে, নারীর কাজ ঘরে। তাই বলে অতি বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে মেয়েকে পিঞ্জিরায় আবদ্ধ করে রাখতে বলেনি। পর্দার অতি বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে বোরখা পড়েও রিক্সার উপর শাড়ী বেধে লওয়ার কি প্রয়োজন আছে! প্রয়োজন নারী বাইরেও যেতে পারে, কিন্তু অপ্রয়োজনে বেআবরুভাবে নয়।

অনেকেই হয়ত সেভাবে চলতে চেষ্টা করে না তা নয়। কিন্তু নিজের পরিবেশে ইহাকে মানাতে গিয়ে নিজকেই বোকা বনতে হয়। তাই সে আর পেরে উঠে না। কিন্তু তাদের ভেবে দেখা উচিত যে মানুষ তার বুদ্ধি বিবেচনা ও চেষ্টা-চরিত্রের দ্বারা নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। যুগে যুগে মহাপুরুষরা এসে প্রাচীন পন্থীদের আচার ব্যবহার ও নিয়ম কানুন সব কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এবং তাঁরা নূতন ভাবধারা সমাজের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আমাদের ভেবে দেখা উচিত শিক্ষার গলদ কোথায়? আমাদের বুদ্ধি ইচ্ছা ও শক্তিকে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে হবে। যদি তা না করে আমরা অন্তর্নিহিত পশু-শক্তির নিকট হার মানি, প্রবৃত্তির উত্তাল তরঙ্গে ভেসে বেড়াই তাহলে শুধু ব্যর্থতা আর অমঙ্গলই ডেকে আনব। প্রগতির নামে অধঃগতিই ডেকে আনব।

রক্ষা করিয়াছেন'।" সুতরাং কোন জিনিষেরই আধিক্য মানুষের জন্য মঙ্গলকর নয়। অধিক জেকরে এলাহীও লাভজনক নয় এবং অধিক নামাজও ফলদায়ক নয়। অধিক রোজাও ইষ্টজনক নয়। সাদকা ও খয়রাতের আধিক্যও উপকারজনক নহে।

মানুষ এই সকল কাজে সীমা অতিক্রম করিলে এই আধিক্যের দ্বারা তাহার ক্ষতি সাধিত হয়। সুতরাং এই সকল বস্তু হইতে মানুষকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে।

আইয়াম্-উস্-সোলেহ্ (শান্তির যুগ)

মূল : হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আলায়হেস্-সালাম)
আখেরী জমানার ইমাম মাহ্দী ও মসিহ্ মউদ
অনুবাদ : দৌলত আহমদ খাঁ খাদিম

(২১)

এই কথায় প্রত্যয় করিবার জন্য যে হজরত ইসা (আঃ) শূলোপরি মৃত্যু লাভ করেন নাই **প্রথম প্রমাণ** এই যে তিনি ইঞ্জিলে ইউনুস নবী (আঃ) এর সঙ্গে নিজের সাদৃশ্য বর্ণনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে যেমন ইউনুস নবী (আঃ) তিন দিবস মাছের পেটে বাস করিয়াছিলেন, তিনিও তিন দিন কবরে বাস করিবেন। এক্ষণে নবীর মুখ-নিসৃত এই সাদৃশ্য অভিনিবেশ যোগ্য। কেননা যদি হজরত মসিহ মৃত অবস্থায় কবরে শায়িত হইয়া থাকেন, তবে মৃত ও জীবিতের মধ্যে সাদৃশ্য কি হইতে পারে? ইউনুস (আঃ) কি মাছের পেটে মৃত অবস্থায় ছিলেন? সুতরাং মসিহ (আঃ) কখনো শূলোপরি প্রাণ-দান করেন নাই এবং মৃত অবস্থায় কবরেও প্রবিষ্ট হন নাই, এই উক্তির মস্তবড় দলিল এই কথা। অতঃপর **দ্বিতীয় প্রমাণ** এই যে পিলাতুসের স্ত্রীকে স্বপ্নে দেখান হইল যে যদি এই ব্যক্তি মারা যায়, তবে তাহাতে তোমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। এক্ষণে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে যদি প্রকৃতপক্ষে ইসা (আঃ) শূলে প্রাণ দিতেন অর্থাৎ শূল কাষ্ঠে বিদ্ধ হওয়ার দরুণ মৃত্যু লাভ করিতেন তবে ফেরেশ্তাহ্ পিলাতুসের স্ত্রীকে যাহা বলিয়াছিল, সেই ভীতি-পূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইত। অথচ ইতিহাসে দেখা যায় যে পিলাতুসের কোন সর্ব্বনাশ হয় নাই। **তৃতীয় প্রমাণ** এই যে হজরত মসিহ (আঃ) সমস্ত রাত্রি স্বীয় প্রাণ রক্ষার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্র দরবারের এরূপ একজন প্রিয় ব্যক্তি সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা করিবেন এবং সেই দোওয়া মঞ্জুর হইবে না, ইহা সাধারণ বুদ্ধির বহির্ভূত। **চতুর্থ প্রমাণ** এই যে শূলোপরি আরোহণের পর মসিহ আবার এই দোওয়া করিয়াছিলেন : "ইলী, ইলী, লেমা সাবাক্তানী, হে আমার খোদা! হে আমার খোদা! **তুমি আমাকে কেন বর্জ্জন করিয়াছ?**" এক্ষণে তাহার ব্যথা ও আবেগ এই সীমা পর্য্যন্ত পৌছিয়া যাওয়ার পর খোদা তাঁহার উপর করুণা করেন নাই, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? **পঞ্চম প্রমাণ** এই যে হজরত মসিহকে শূলের উপর মাত্র দেড় ঘণ্টা রাখা হইয়াছিল এবং হয়তঃ তার চেয়েও অল্প সময় এবং তৎপর তাঁহাকে নামান হইয়াছিল এবং এরূপ অল্প সময় এবং অল্প যন্ত্রনায় তাঁহার প্রাণ-বায়ু নির্গত হওয়া অনুমান বিগর্হিত বটে। এবং শূলের উপরে যীশুর প্রাণ নির্গত হওয়া সম্বন্ধে ইহুদীদের পাকা ধারণা হয় নাই। কেননা, ইহার সমর্থনে আল্লাহতা'লা কোরআন শরীফে বলিতেছেন, ওমা কাতালুহু এ্যকিনান নিশ্চিতভাবে তাহারা তাঁহাকে হত্যা করে নাই অর্থাৎ ইহুদীরা মসিহর হত্যা সম্বন্ধে অনুমানের মধ্যেই রহিয়াছিল এবং নিশ্চিতরূপে তাহারা বুঝে নাই যে প্রকৃতই তাহারা হত্যা করিয়াছে। **ষষ্ঠ প্রমাণ** এই যে যখন যীশুর দেহে সামান্য একটু ছিদ্র করা হইয়াছিল, তখন তাহা হইতে রক্ত নির্গত হইয়াছিল এবং রক্ত নির্গত হইতে দেখা গেল এবং মৃতদেহ হইতে রক্ত নির্গত হওয়া সম্ভব নয়। **সপ্তম প্রমাণ** এই যে শূল-বিদ্ধ লোকদের হত্যা করিবার এক আবশ্যক কার্য্য হইল তাহাদের অস্তি ভাঙ্গিয়া দেওয়া কিন্তু যীশুর অস্তি সমূহ ভঙ্গ করা হয় নাই। ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় তিন দিন শূলের উপরে রাখা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি জীবিত থাকিত। তবে যে ব্যক্তি মাত্র কয়েক মিনিট শূলে ছিল এবং যাহাতে অস্থিও ভঙ্গ করা হয় নাই, এরূপ ব্যক্তি কিরূপে মরিয়া যাইবেন? **অষ্টম প্রমাণ** এই যে ইঞ্জিলে প্রমাণিত আছে যে যীশু শূল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নিজের হাওয়ারী (প্রধান শিষ্য)দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে তাঁহার ক্ষতগুলি দেখাইয়াছিলেন এবং যদি যীশু মৃত্যুর পর একটি টাট্কা এবং নূতন গৌরবপূর্ণ দেহ লাভ করিতেন, তবে ঐ সমস্ত ক্ষত ঐ অবস্থায় বিদ্যমান থাকা সম্ভব ছিল না। **নবম প্রমাণ** হজরত ইসা (আঃ) এর শূল কাষ্ঠের মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবার সপক্ষে মরহুমে ইসার এই ব্যবস্থা-পত্র। কেননা, মোসলমান চিকিৎসকগণ, খৃষ্টান ডাক্তারগণ, রোমক, অগ্নি পোজক এবং ইহুদী চিকিৎসকগণ পরস্পর ষড়যন্ত্র করিয়া এরূপ একটি গল্প সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা সম্ভব নয়। বরং এই ব্যবস্থা-পত্র শত শত চিকিৎসা-গ্রন্থে আজ পর্য্যন্ত লিখিতভাবে বিদ্যমান আছে। সামান্য যোগ্যতা বিশিষ্ট কোন লোকও করাবাদীন কাদেরী গ্রন্থে চর্ম্ম-রোগের মধ্যে এই ব্যবস্থা-পত্র লিখিত দেখিতে পাইবে। এই কথা স্পষ্ট যে মুখ্হাবী ধরণের লেখার মধ্যে কয়েক প্রকার কম বেশ সম্ভব হইয়া থাকে কেননা অধিকাংশ স্থলেই বিরূপ মনোভাবের মিশ্রণ হয়। কিন্তু যে সমস্ত পুস্তক বৈজ্ঞানিক ধরণে লিখিত হইয়াছে সেইগুলিতে চরম অনুসন্ধান ও গবেষণার আশ্রয় লওয়া হয়। সুতরাং মরহুমে ইসার এই ব্যবস্থা-পত্র প্রকৃত রহস্য উদ্ধারের পক্ষে একটি উচ্চ শ্রেণীর উপায় বটে এবং ইহা হইতে বুঝা যায় হজরত ইসা (আঃ) আকাশে চলিয়া গিয়াছিলেন এই মতবাদ কোন পর্য্যায়ের; এবং ইহা স্বতঃ সিদ্ধ যে হজরত ইসা (আঃ)এর দেহকে আকাশে উঠাইবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। খোদাতা'লা বিজ্ঞ, অনর্থক কোন কার্য্য তিনি কখনও করেন না। যখন তিনি আমাদের নবী (দঃ)কে মক্কা হইতে মাত্র দুই তিন মাইল দূরবর্ত্তী ছুর গর্ত্তে লুকাইয়া রাখিলেন এবং সমস্ত অনুসন্ধানকারীগণকে ব্যর্থ ও বিফল মনোরথ অবস্থায় প্রত্যাগত করিলেন, তবে কি হজরত মসিহকে তিনি কোন পর্ব্বত গুহায় লুক্কায়িত করিতে পারিতেন না এবং দ্বিতীয় আকাশে উত্তোলন ব্যতীত ইহুদিদের সাহস ও অনুসন্ধানের ভীতি তাঁহার মনে সঞ্চার হইয়াছিল?

এতদ্ব্যতীত কোন আয়েত বা হাদিসে প্রমাণিত হয় না যে কোরাণ শরীফ অথবা হাদিসের অন্যত্র কুত্রাপি হজরত ইসা (আঃ) সম্বন্ধে "মউদ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। * হাঁ, "রফা" শব্দ পাওয়া যায় যাহা "তাওয়াফ্ফা" শব্দের পরে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং কোরাণ ও হাদিসের অনেক স্থল হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে "তাওয়াফ্ফার" পরে বিশ্বাসীদের "রফা হয় অর্থাৎ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর বিশ্বাসীদের আত্মা আল্লাহর দিকে আহুত হয় যেমন "ইরজি-ই এলা রাব্বেকী" তোমার প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্ত্তন কর এই আয়েত হইতে বুঝা যায়। আর যদিও সমস্ত নবী-রসুল, সিদ্দিক, আওলিয়া এবং সমস্ত মোমেন বিশ্বাসীগণ মৃত্যুর পর আধ্যাত্মিকভাবে আল্লাহতা'লার দিকে উত্থিত হন, এবং "রফা" (উত্তোলন)এর সম্মানলাভ করেন। তথাপি কোরাণ শরীফে হজরত ইসা (আঃ)এর রফা সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইবার কারণ এই যে ইহুদিগণ তাঁহার আধ্যাত্মিক উত্তোলনের ঘোর বিরোধী ছিল এবং এখনও আছে এবং তাঁহাদের দলিল এই যে যীশু অর্থাৎ ইসা (আঃ) শূল-বিদ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তৌরাতে লিখিত আছে যে যে ব্যক্তিকে শূলে দিয়া হত্যা করা হয়, আহার আধ্যাত্মিক উত্তোলন হয় না। অর্থাৎ তাহাদের আত্মা আল্লার সমীপস্থ আরাম-স্থলে উত্থিত হয় না বরং অভিশপ্ত অবস্থায় নিম্নদিকে নিক্ষিপ্ত হয়। আর আল্লাহতা'লা অভিপ্রায় করিলেন যে তিনি ইহুদীদের এই আপত্তি খণ্ডন করিবেন এবং হজরত মসিহর আধ্যাত্মিক উত্তোলনের সাক্ষ্য দিবেন। সুতরাং সেই সাক্ষ্যের উদ্দেশ্যেই তিনি বলেন : "ইয়া ইসা ইন্নি মুত্ওয়াফ্ফীকা ও রাফেউকা ইলাইয়্যা ও মুতাহ্হেরুকা মিনাল্-

---

*সহি হাদিসে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে হজরত ইসা (আঃ)এর বয়স ১২০ বৎসর ছিল। সহিহ্ হাদিস হইতে প্রমাণিত হয় যে হজরত ইসা (আঃ) ইহলোক ছাড়িয়া মৃতদের জগতে গমন করিয়াছিলেন এবং এখন পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যেই বাস করিতেছেন যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি খাদ্যও খান না, পানীয়ও পান করেন না, নিদ্রাও যান না এবং ইহলোকের জীবনের আর কোন বৈশিষ্ট তাঁহার মধ্যে পাওয়া যায় না। ইয়াহিয়া নবী মৃত্যুলাভ করিয়া যে পরলোকে গমন করিয়াছেন তিনি তাঁহার সহিত আছেন।

লাজিনা কাফারু" * —অর্থাৎ হে ইসা, আমি তোমাকে মৃত্যু দান করিব এবং মৃত্যুর পরে তোমাকে নিজের দিকে উঠাইব এবং তোমাকে ঐ সমস্ত অপবাদ হইতে পবিত্র করিব যাহা তোমার উপর ঐ সমস্ত লোক আরোপ করিয়াছে যাহারা তোমার ধর্ম্মমত স্বীকার করে না। ইহা স্পষ্ট যে এ স্থলে শারীরিক উত্থানের কোন তর্কই ছিল না এবং ইহুদীদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের মধ্যে কখনও এই কথা ছিল না যে সশরীরে যাহার উত্থান না হয়, সে কখনও নবী বা মোমেন হয় না। অতএব এই অর্থহীন কাহিনী প্রচারের কি প্রয়োজন ছিল? খোদাতা'লার বাণী অর্থহীনতা হইতে মুক্ত। তিনি তো ঐ সমস্ত ব্যাপারের ফয়সালা করেন যেগুলির ফয়সালা করা প্রয়োজনীয়। অসৎ ইহুদীগণ নাউজুবিল্লাহ্ হজরত মসিহকে কাফের ও মিথ্যুক ও ভণ্ড বলিয়া অভিহিত করিত এবং বলিত যে মুসা এবং সমস্ত সাধু সজ্জনদের মত তাহার আধ্যাত্মিক "রফা" (উর্দ্ধগতি) হয় নাই এবং খৃষ্টান-গণও তাহাদের সঙ্গে কতকটা সায় দিতে লাগিল। অতএব আল্লাহতা'লা ফয়সালা করিলেন যে এই দুই দলই মিথ্যাবাদী এবং হজরত মসিহ (আঃ) নিশ্চয়ই অন্যান্য সাধুদের মতই মৃত্যুর পর খোদা-তা'লার দিকে উত্তোলিত হইয়াছেন। হাদিসে আছে যে ইসা এবং তাঁহার মা শয়তানের স্পর্শ হইতে পবিত্র। ইহাও অবিকল সেই ফয়সালা। হাদিসে ইহার এই অর্থ করিয়াছে যে হজরত ইসা এবং তাহার মা ব্যতীত অপর কেহ নবী হউক বা রসুল হউক, শয়তানের স্পর্শ হইতে পবিত্র নয় অর্থাৎ নিষ্পাপ নয় এবং "ইন্না এবাদী লাইসালাকা আলায়হিম সোলতান" অর্থাৎ আমার দাসদের উপর তোমার কোন কর্তৃত্ব চলিবে না এই আয়েত কি তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে এবং সালামুন আলায়হে ইয়াওমা উলেদা তাঁহার জন্মের দিন আল্লাহ তাঁহার উপর শান্তি বর্ষণ করিয়াছিলেন এই কথা কি তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে? কথা মাত্র এই ছিল যে এই হাদিসে ইহুদীদিগকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা এবং তাহাদের আপত্তি খণ্ডন করা উদ্দেশ্য ছিল। যেহেতু তাহারা হজরত মরিয়ম এবং হজরত ইসা (আঃ) এর উপর নানা প্রকার অকথ্য অপবাদ আরোপ করিত সেই জন্য খোদার পবিত্র রসুল সাক্ষ্য দিলেন যে ইহুদিদের মধ্যে শয়তানের স্পর্শ (পাপ) হইতে কেহই মুক্ত ছিল না। যদি কেহ মুক্ত ছিল তবে সে ছিল হজরত ইসা এবং তাঁহার মাতা। না'উজুবিল্লাহ্, এই হাদিসের তো এই উদ্দেশ্য এবং অর্থ নয় যে একমাত্র হজরত ইসা এবং তাহার মাতাই নিষ্পাপ ছিলেন এবং এতদ্ব্যতীত কেহই নবী হউন বা রসুল হউন, শয়তানের স্পর্শ হইতে নিষ্পাপ ছিলেন না।

আমাদের কোন কোন অজ্ঞ উলামা যেরূপ এই ভুল করিয়া থাকেন তেমনি এই ভুলও করিয়া থাকেন যে "রফা" অর্থে তাহারা সশরীরে উত্থান ধরিয়া বসিয়া আছেন। অথচ সশরীরে উত্থানের কোন প্রশ্নই ছিল না। এই প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণও হইতে পারে না। কেননা, পৃথিবীর কোন ধর্ম্ম অনুসারেই সশরীরে উত্থান মুক্তির শর্ত্ত নয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক উত্থান মুক্তির শর্ত্ত বটে এবং ইহুদীদের চেষ্টা এই ছিল যে তৌরাত অনুসারে যে বৈশিষ্ট মুক্তির শর্ত্ত, তাহা হজরত ইসার মধ্যে নাই, এই কথা প্রমাণ করা। অর্থাৎ ইহা প্রমাণ করা যে সেই বৈশিষ্ট তাঁহার মধ্যে নাই। সেই উদ্দেশ্যেই তাহারা স্বীয় জ্ঞানে (হজরত ইসাকে) শূলে চড়াইয়াছিল এবং তৌরাতে বর্ণিত শূলের ফল এই নয় যে যে ব্যক্তিকে শূল দেওয়া হয় সে সশরীরে আকাশে উত্তোলিত হয় না। বরং ইহার অর্থ এই যে সাধু লোকদের সদৃশ তাহার আত্মা খোদার দিকে উত্তোলিত হয় না। ইহুদী এখনও বিদ্যমান আছে। কাহারও সত্যান্বেষণের স্পৃহা থাকিলে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিত যে তোমরা শূলে চড়ান হইতে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছ? এই সিদ্ধান্ত কি করিয়াছ যে শূলে চড়ানোর ফলে হজরত ইসা (আঃ) সশরীরে আকাশে উঠিতে পারিলেন না, অথবা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছ যে শূলে চড়ানোর ফলে আল্লাহর দিকে তিনি আধ্যাত্মিক উর্দ্ধগমনে ব্যর্থ মনোরথ হইলেন? এই ব্যাপারে মীমাংসা কি কঠিন ছিল? কিন্তু এই ধর্ম্ম-বিপ্লবের যুগে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যেও একজন এরূপ লোক পাওয়া দুষ্কর যার মধ্যে সত্যান্বেষণের ব্যাকুলতা আছে। আমাদের মত দাসদের উপর আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ এই যে তিনি সকল দিক দিয়া সত্যপ্রকাশ করিয়া দেন এবং কোন কোন প্রমাণকে অপরগুলির সাক্ষ্য-স্বরূপ করিয়া দেন এবং যে পর্য্যন্ত সৎ ও অসতের মধ্যে পার্থক্য সাধিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হন না। অতএব তাঁহারই সাহায্যে এই এক শক্তির লীলাখেলা দেখা যায় যে মরহমে ইসার ব্যবস্থা-পত্র সমস্ত পুস্তকাদিতে পাওয়া গিয়াছে এবং প্রমাণিত হইয়াছে যে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত চিকিৎসকই মরহমে ইসার ব্যবস্থা-পত্র স্ব স্ব পুস্তকে লিখিয়া আসিতেছেন এবং এই কথা লিখিয়া আসিতেছেন যে এই মরহম যাহা জখম ও আঘাতা দিতে অতি ফলপ্রদ তাহা হজরত ইসা (আঃ)এর জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল। চিকিৎসকদের এই গবেষণা এইরূপ এক গবেষণা যে তাহাতে সমস্ত ঐশী রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া যায় এবং প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ধার হইয়া যায় এবং পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হয় যে হজরত ইসা (আঃ)র জীবনীতে আসল কথা মাত্র এই ছিল যে খোদাতা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে তিনি শূল কাষ্ঠের মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন তৎপর এই মরহম দ্বারা চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার জখমগুলির চিকিৎসা হইয়াছিল। এই কথা বাইবেল হইতেও প্রমাণিত হয় যে যেখানে শূলে চড়ান হইয়াছিল সেই স্থলেই তিনি গোপনে চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। তৎপর তাঁর প্রতি যেরূপ আদেশ ছিল, তদনুসারে তিনি ঐ সমস্ত দেশে গমন করিলেন যে যে দেশে ইহুদিগণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করিত। সুতরাং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি কাশ্মীর পৌছিলেন এবং কাশ্মীরে একশত বিশ বৎসর বয়সে মৃত্যুলাভ করেন এবং শ্রীনগর সহরস্থিত খান ইয়ার মহল্লায় তাঁহার সমাধি আছে এবং সেইস্থলে সাহজাদা ইউজ আসেফ নবী নামে তিনি খ্যাত হইয়াছেন ওখানকার লোকেরা বলে যে এই নবীর মৃত্যুর পর উনিশ শত বৎসর অতীত হইয়াছে।*

মোটের উপর এই মরহমে ইসা হজরত ইসার অলৌকিক কাণ্ড সমূহের অন্যতম এবং ইহাতে এখন পর্য্যন্ত ক্ষত ও আঘাত আরোগ্যের প্রভাব রহিয়াছে। প্লেগের সময় এই মরহম বড়ই উপকারী। ইহা ব্যবহার করিবার নিয়ম এই যে যে যে স্থলে প্লেগের গুটি বাহির হয় তত্তৎস্থলে উহা মালিশ করিতে হয়। যেমন কর্ম্মমূলে গ্রীবা দেশের নিম্নভাগে, বগলে এবং উরু ও কটি দেশের সঙ্গম স্থলে। এতদ্ব্যতীত জিদ্ওয়ার এর শিরকার সহিত মিশ্রিত করিয়া বড়ি প্রস্তুত পূর্ব্বক প্রত্যহ ছয় রতি পরিমাণ বড়ি দুধের খাঁছের সঙ্গে খাইতে হয়। আর স্পিরিট কেম্ফর (কর্পূরের আরক) ক্লোরোফরম এবং ওয়াইনাম পিকাক একত্র মিশ্রিত করিয়া যেন বিশ ফোটার অতিরিক্ত না হয়, ইহাতে সাত তোলা পরিমাণ পানি ঢালিয়া দিতে হইবে এবং আমি যাহার নাম তিরইয়াকে এলাহি রাখিয়াছি, ইয়াকুতে রম্মানীর সঙ্গে সকাল, দুপর এবং সন্ধ্যা এই তিনবার ব্যবহার করিতে হইবে।

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

---

*বিরুদ্ধবাদিদের অবস্থা দেখিলে কান্না আসে। যদি ইন্নি মুত্ওয়াফ্ফীকা ও রাফেউকা ইলাইয়্যা শীর্ষক আয়েতের ভিন্ন ভিন্ন মৃত্যু বর্ণনা করা উদ্দেশ্য থাকিবে এবং অভিশপ্ত হইবার পরিবর্ত্তে আধ্যাত্মিক উত্তোলন বর্ণনা করার উদ্দেশ্য না থাকিবে, তবে এই কাহিনী বর্ণনা করিবার কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে এবং সশরীরে উত্থানের কিইবা ধর্ম্মীয় প্রয়োজন হইতেছিল? দুঃখের বিষয় তাহারা সহজ সরল কথাকে অনর্থক বিগড়াইয়া থাকে। কথা তো মাত্র এই যে ইহুদীরা হজরত ইসা (আঃ)কে অভিশপ্ত সাব্যস্ত করিয়া আধ্যাত্মিক উত্থানের অস্বীকারকারী হইয়াছিল। এক্ষণে "রাফেউকা ইলাইয়্যা" দ্বারা এই কথা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য ছিল যে হজরত ইসা (আঃ) "মালাউন" (অভিশপ্ত) ছিলেন না বরং খোদাতা'লার দিকে তাঁহার উত্থান হইয়াছিল এবং "তাওয়াফ্ফা" শব্দ সহিহ্ বোখারীতে যাহার অর্থ করা হইয়াছে "হত্যা করা," উহা দ্বারা হজরত ইসা (আঃ)এর মৃত্যু প্রমাণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত "খালাত" শব্দ কোরাণ শরীফে যে যে স্থানে মানুষের প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে, মৃত্যুর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং আয়েত "কাদ খালাত মিন্ কাব্লিহির্ রুসুল" দ্বারাও হজরত ইসা (আঃ)এর মৃত্যু প্রমাণিত হইল। মৃত্যুর এতগুলি প্রমাণ অথচ তার পরেও অস্বীকার। আপশোষ, ইহা কি পদ্ধতি!

*বর্ত্তমানে তিব্বতের কোন গুহা হইতে একটি বাইবেল আবিষ্কৃত হইয়াছে। জনৈক রুশীয় পণ্ডিত ইহা অনেক চেষ্টা-চরিত্র দ্বারা মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহা প্রকাশিত হওয়াতে পাদ্রিগণ বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছে এই ঘটনাও কাশ্মীরের সমাধির ঘটনার একটি প্রমাণ বটে। এই বাইবেল পাদ্রীদের বাইবেল হইতে অনেক ভিন্ন এবং বর্ত্তমান ধর্ম্ম-বিশ্বাসেরও ঘোর বিরোধী। এই কারণেই এই দেশে ইহার প্রচার বন্ধ রাখা হইয়াছে। কিন্তু আমরা ইহার তর্জমা করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টায় আছি।

তবলীগে হেদায়েত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মূল : হজরত মীর্জা বশীর আহ্‌মদ সাহেব
অনুবাদ : এ, এইচ, এম্‌, আলী আন্‌ওয়ার

কাওণ্ট্‌ টল্‌ষ্টয়, বিখ্যাত রাশিয়ান গ্রন্থকার লিখিয়াছিলেন, "এই পত্রের ভাবাবলী অতি গুরুত্ব-পূর্ণ ও অতি সত্য।"

"এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অব্‌ ইসলামের সর্ব্ব প্রধান সম্পাদক প্রফেসার হাওষ্টমা লিখিয়াছেন, "এই পত্র অতিশয় উপাদেয়।"

"রিভিউ অব্‌ রিভিউজ," লণ্ডন, লিখিয়াছে, "ইয়ুরোপ ও আমেরিকার যে সকল ব্যক্তি মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম) ধর্ম্ম সম্বন্ধে জানিতে আগ্রহান্বিত, তাঁহারা অবশ্য এই পত্রের গ্রাহক হইবেন।"

মিস্‌ হাণ্ট (পয়েট লরেট) আমেরিকা হইতে লিখিয়াছেন, "এই পত্রের প্রত্যেক সংখ্যাই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। সভ্যরূপে পরিচিত জাতিরা এ যুগে পৃথিবীতে ইসলামের বিরুদ্ধে যে সকল ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করিয়া থাকে, এই পত্র সেগুলি অপনোদন করে।" (উল্লিখিত অভিমতগুলি ইংরাজী হইতে অনুদিত। বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'রিভিউ অব্‌ রিলিজিয়ন্‌স্‌' দেখুন)

সেইরূপ, আহমদীয়া জমাতের মাসিক ও অন্যান্য পত্রগুলি ও স্ব স্ব সীমানার মধ্যে ইসলামের খেদমত করিতেছে। হজরত মীরজা সাহেবের ওফাতের পর জমাত যতই উন্নতি করিতেছে, আমাদের ধর্ম্মীয় পত্র সমূহ ততই বৃদ্ধি লাভ করিতেছে। বর্ত্তমানে পাঁচটি উর্দ্দু পত্রিকা (একটি দৈনিক, তিনটি সাপ্তাহিক, একটি পাক্ষিক) এবং দুইটি মাসিক পত্র আছে। তদ্ব্যতীত একটি ইংরাজী ত্রৈমাসিক, একটি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকাও আছে। (ডাচ ও জর্ম্মান ভাষায় দুইটি মাসিক, একটি সোহেলী, আরো একটি দৈনিক উর্দ্দু এবং ইংরাজীতে অন্যান্য ভাষায়ও কয়েকটি পত্র প্রকাশিত হইতেছে। বাংলা ভাষায় পাক্ষিক 'আহমদী' বাহির হয়) [অনুবাদক] তদ্ব্যতীত হ্যাণ্ডবিল, প্যামফ্লাট, এবং বই পুস্তকও বহু সংখ্যায় প্রকাশ পাইতেছে। কাদিয়ান হজরত মীরজা সাহেবের সময় একটি গণ্ড গ্রাম ছিল। এখন এখানে কয়েকটি উর্দ্দু মুদ্রণ যন্ত্র আছে। তদ্ব্যতীত বহু দপ্তর এবং স্কুল কলেজ ছাড়া ধর্ম্ম শিক্ষার এক মহান বিদ্যালয়ও আছে। উহাতে দীনিয়াত, আরবী জ্ঞান বিজ্ঞান এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া এবং ইসলাম প্রচারার্থে মোবাল্লেগগণ প্রস্তুত হন। (পাক-ভারত রাষ্ট্রদ্বয় উদ্ভবের পর পূর্ব্ব ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হিজরতের চিহ্ন (দাগে-হিজরত) সহ পশ্চিম পাঞ্জাবের ঝঙ্গ্‌ জেলায় 'রাব্‌ওয়াহ্‌' নামে জমাতের এক নূতন বিশ্বকেন্দ্র স্থাপিত হইয়া বিশ্বময় সেল্‌সেলার কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। (সঃ আঃ)

এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে আমাদের মোবাল্লেগগণ আছেন এবং ভারতের বাহিরে ইংলণ্ডে আমাদের রীতি মত মিশন আছে। সেখানে একটি মস্‌জিদও নির্মিত হইয়াছে। বহু ইংরাজ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। উত্তর আমেরিকা অর্থাৎ আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রে আমাদের মিশন আছে। আমেরিকায় বহু লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। দক্ষিণ আমেরিকায়ও আমাদের মিশন আছে। মরিশাসে আমাদের মিশন আছে। সেখানে একটি সুদৃঢ় জমাত হইয়াছে। ইরাণে আমাদের মিশন আছে। মিশর, ফেলিস্তিন ও সিরিয়ায় একটি মিশন আছে, যেন এই সকল দেশেও আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ এবং নানা প্রকার ফ্যাসাদের ইস্‌লাহ্‌ করা যায়, যাহা হজরত মীরজা সাহেবের দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'লা দূরীভূত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। একটি মিশন নাইজিরিয়া, পশ্চিম আফ্রিকায় আছে। একটি আছে গোল্ডকোষ্ট্‌ ও সিরালীওনে। সেখানে মূর্ত্তি-পূজারী ও খৃষ্টীয়ান জাতিগণের মধ্যে দ্রুতবেগে ইস্‌লাম প্রবেশ করিতেছে এবং সহস্র সহস্র লোক আহমদিয়ত গ্রহণ করিয়াছেন। যাভা ও সুমাত্রায় একটি অতিশয় সফল মিশন আছে। একটি মিশন মলয় উপদ্বীপে আছে। জাপানেও আমাদের মিশন আছে। চীনেও আছে। স্পেনে আমাদের মিশন আছে। ইটালীতেও আমাদের মিশন আছে, হাঙ্গেরীতেও আছে। (দ্বিতীয় মহাসমর উপলক্ষে এই মিশন আপাততঃ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও শীঘ্রই পুনঃ স্থাপিত হইবে) আফগানিস্তানে ধর্ম্ম স্বাধীনতা না থাকা সত্ত্বেও সেখানে সহস্র সহস্র ব্যক্তি নিয়া আমাদের জমাত আছে। এরাকে এবং ইরাণেও তবলীগের কাজ চলিতেছে। তদ্ব্যতীত সেল্‌সেলা আহ্‌মদিয়ার তরফ হইতে ইসলামের তবলীগের জন্য শত শত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অধিকাংশই অতি উচ্চাঙ্গীণ এবং শত্রু-মিত্র সকলের নিকট আদরনীয় হইয়াছে। সেইরূপ, পাশ্চাত্য দেশ সমূহের বিভিন্ন ভাষায় কোরআন শরীফের অনুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

ইহা হজরত মীরজা সাহেব এবং তাঁহার মুষ্টিমেয় জমাতের প্রচার কার্য্যের একটি অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র। কিন্তু দেখুন, ইহা কত বিরাট কার্য্য যাহা করা হইয়াছে এবং করা হইতেছে। এই কার্য্য খোদাতা'লার ফজলে দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে। এখন এক দিকে এই কাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, যদিও এখনো ইহা অবশ্য প্রারম্ভিক অবস্থা মাত্র। তারপর আহমদিয়া জমাতের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন এবং সাধারণ মোসলমানগণকেও দেখুন, অন্যান্য মোসলমান ৪০ কোটি হওয়ার দাবী করেন। তাঁহাদের মধ্যে বাদশাহ্‌ আছেন। বড় বড় রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টও আছেন। বড় বড় রিয়াসতের নবাবগণও আছেন। বড় বড় পদপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণও আছেন। বড় বড় জায়গীরদার এবং জমিদারেরাও আছেন। কোটিপতি, লক্ষপতি ব্যবসায়ী ও শিল্প-পতিরাও আছেন। আমীর কবীর, মহাধনীরাও দ্বীনের আলেম বলিয়া অভিহিত ব্যক্তিগণও আছেন এবং পার্থিব জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিরাও আছেন। তারপর, জমাত ও মাশাল্লাহ্‌, বড় হইয়া উঠিলে মহাপ্লাবনের ন্যায় সারা বিশ্ব প্লাবিত করিতে পারে। আমাদের জমাতের লোক সংখ্যার কথা উল্লেখ করিলে লোকেরা হাসে। আর্থিক অবস্থা এরূপ যে শতকরা ৭৫ জন সারা দিন পরিশ্রমের ফলে পরিবারের জন্য শুধু এই পরিমাণ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ যে, খোদা না করুন কয়েক দিনের জন্যও কোনরূপে অসুস্থ হইয়া পড়িলে এবং কাজে উপস্থিত না হইতে পারিলে গৃহে অনশন দেখা দেয়। এমতাবস্থায় এই শিশুর জমাতের এবম্প্রকার কার্য্য এবং বড় বড় সম্প্রদায়গুলি ইসলামের খেদমতের নামও স্মরণ নাই। পাঠকগণ, একটু চিন্তা করুন। স্মরণ রাখিবেন ইন্‌সাফ্‌। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদিগকে আল্লাহ ভালবাসেন। ("ও আল্লাহ ইয়ুহিব্বুল্‌ মুক্‌সেতীন")

আইয়াম্‌-উস্‌-সোলেহ্‌

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

আর যদি তিরইয়াকে ঐলাহী না পাওয়া যায়, তবে মাত্র ঐ সমস্ত আরকই উপরুক্ত নিয়মে পান করিতে হইবে এবং জিদ্‌ওয়ারের বড়িও খাইতে হইবে। ইন্‌শা'ল্লাহ্‌ উপকার হইবেই। এবং দশ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুদের তিন ফোটাই যথেষ্ট।

আমি পাঠকদের সাধারণ অবগতির জন্য ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্লেগ সম্বন্ধে যে ইশতাহার প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা নিম্নে সন্নিবেসিত করিলাম যেন বুঝা যায় যে কিরূপে খোদাতা'লা স্বীয় এলহাম দ্বারা সময়ের পূর্ব্বে কোন কোন ঐশী রহস্য আমার নিকটে প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যেন ভাবীকালে এই ইশ্‌তাহার ইমানের দৃঢ়তার কারণ হয় এবং সত্যের অন্বেষণকারিগণের জন্য পূর্ণ প্রত্যয়ের কারণ হয় এবং তাহ এই।

(ক্রমশঃ)

হজরত মীরজা সাহেবের সম্বন্ধে বিরুদ্ধবাদীদের অভিমত :

এখন আমি গয়ের আহমদী এবং গয়ের মোসলেমগণের কতিপয় অভিমত যাহা তাঁহারা হজরত মীরজা সাহেব সম্বন্ধে সময় সময় প্রকাশ করিয়াছেন উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গটি শেষ করিতেছি। প্রথম অভিমতটি মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বটালবীর। তিনি 'বারাহীনে আহমদীয়ার' সমালোচনা করিতে যাইয়া ইহা প্রকাশ করেন। তিনি তখনো হজরত মীরজা সাহেবের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন না। মৌলবী সাহেব লিখিয়াছিলেন :—

"আমাদের মতে এই কেতাব (অর্থাৎ, হজরত মীরজা সাহেব প্রণীত 'বারাহীনে আহমদীয়া') এ যুগে বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এমন পুস্তক যে ইহার অনুরূপ কোন পুস্তক আজ পর্য্যন্ত

ইসলামে প্রকাশিত হয় নাই এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। "লা আল্লাহা ইয়ুহ্‌দেস্থ বাদা জালেকা আম্‌রা" ইহার প্রণেতা ও ইসলামের সাহায্য ব্যাপারে ধন, প্রাণ, লেখনী, বক্তৃতা এবং স্থায়ী ও অস্থায়ী আধ্যাত্মিক প্রভাবের দিক হইতে এমনি সত্যনিষ্ঠ ও একাগ্রচিত্ত হওয়া প্রমাণিত হইয়াছেন যে ইহার নজীর পূর্ব্ববর্ত্তী মোসলমানগণের মধ্যেও অত্যল্প পাওয়া যায়। আমাদের এই কথাগুলিকে কেহ এশীয় উচ্চ প্রশংসা বলিয়া মনে করিলে আমাদিগকে অন্ততঃ একটি মাত্র পুস্তকের নাম বলুন যে উহাতে সকল সম্প্রদায়ের ইসলাম বিরোধীর বিশেষতঃ আর্য্য সমাজ ও ব্রাহ্ম সমাজের সহিত এমন জোর-শোরে সম্মুখীন হইতে পাওয়া যায় এবং দুই চারিজন এরূপ ইসলাম সমর্থকের নিশানদেহী করুন, যাঁহারা ধন প্রাণ, কলম ও কথা দ্বারা ইসলামের সাহায্য করা বাদেও আধ্যাত্মিক প্রভাবের দিক হইতেও সাহায্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইসলামের বিরোধী ও এল্‌হাম অস্বীকারকারীদের সম্মুখীন হইয়া প্রতিযোগিতা মূলক উপায়ে এই দাবী জানাইয়াছেন যে এলহামের সত্তা সম্বন্ধে কাহারো সন্দেহ থাকিলে সে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে এবং তাঁহারা এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্বাদও অন্য জাতি-দিগকে প্রদান করিতে পারিয়াছেন। .....গ্রন্থকার সাহেব আমার প্রতিবেশী। প্রথম জীবনে (যখন আমরা 'কুতবী' ও 'শরহে মোল্লা' পাঠ করিতাম) আমরা সহপাঠী ছিলাম। সেইকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে পারস্পরিক চিঠি-পত্রের আদান প্রদান এবং দেখা সাক্ষাৎ বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। এই জন্য আমার একথা বলা যে আমি তাঁহার অবস্থা এবং তাঁহার ভাবধারার সহিত সুপরিচিত, কোন উচ্চ বাচ্য বলিয়া বিবেচিত হইবার নয়। ....'বারাহীনে আহমদীয়া' প্রণেতা মোসলমানগণের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন এবং ইসলাম বিরোধীদিগকে প্রতিযোগিতা মূলক উপায়ে সম্মুখীন হওয়ার জন্য আহ্বান করিয়া সর্ত্তাবলী নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তিনি বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে ঘোষণা করিয়াছেন যে ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে কাহারো কোন সংশয় থাকিলে সে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারে। .....হে খোদা, তোমার অন্বেষীদের পথ প্রদর্শক, তুমি তাঁহার প্রতি, তাঁহার মাতাপিতার প্রতি, বিশ্বের তোমার সকল প্রিয় ভাজনগণের চেয়ে অধিক দয়া কর। তুমি লোকের মনে এই কেতাবের প্রেম সৃষ্টি কর এবং ইহার আশীর্ব, ইহার বরকত সমূহ দ্বারা লাভবান কর। তোমার কোন সালেহ্‌ বান্দার দরুণ এই দীনহীন, লজ্জিত গোনাহগারকে তোমার দান, তোমার পুরস্কার এবং এই কেতাবের বিশেষাপেক্ষা বিশেষ বরকত ইহার আশীষ সমূহের দ্বারা ধন্য হইতে দাও। "ও লিল্‌ আরদে মিন্‌ কসিল কেরামে নাসীবুন্‌।" ('এশাতুস্‌ সুন্নাহ্‌,' ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ সংখ্যা, সপ্তম খণ্ড, ১১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

সম্ভবতঃ, এখানে একথা বলিবার কোনই প্রয়োজন নাই যে হজরত মীরজা সাহেব 'মসিহ মাওউদ' হইবার দাবী প্রকাশ করিলে এই মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বটালবীই সর্ব্বপ্রথমে কাফেরীর ফতোয়া লইয়া দেশব্যাপী ছুটাছুটী করিয়া হজরত মীরজা সাহেবকে "দাজ্জাল", "কাফের," "মুল্‌হিদ" এবং "ইসলামের গণ্ডী হইতে বহির্ভূত" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। "বে-বীন তাফাওতে রাহ্‌ রা আজ্‌ কুজা আস্ত তা বকুজা।"

এই প্রসঙ্গে যে অভিমতটি এখন আমি উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা অমৃত সহরের সুপ্রসিদ্ধ গয়ের আহমদী পত্রিকা 'উকীলের' অভিমত। হজরত মীরজা সাহেবের ওফাতের পর 'উকীল' ইহা প্রকাশ করেন। উহা এই :—

"সেই ব্যক্তি, এক মহামানব। তাঁহার কলম ছিল ঐন্দ্রজালিক। তাঁহার বাক্য ছিল যাদু। সেই ব্যক্তি! তাঁহার মস্তিষ্ক ছিল মূর্ত্তিমান আশ্চর্য্য। তাঁহার দৃষ্টি ছিল উল্কা। তাঁহার ধ্বনি ছিল 'হাশর'। তাঁহার অঙ্গুলীগুলি হইতে যুগ পরিবর্ত্তক বৈদ্যুতিক তারগুলি প্রবাহ রচনা করিত। তাঁহার মুষ্টিদ্বয় বিদ্যুৎ-পূর্ণ দুইটি ব্যাটারী ছিল। সেই ব্যক্তি ধর্ম্ম জগতের জন্য ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ভূমিকম্প ও তুফান স্বরূপ ছিলেন। তিনি কিয়ামতের কোলাহলে গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তিদিগকে জাগ্রত করিতেছিলেন। শূন্য হস্তে তিনি পৃথিবী হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। ("শূন্য হস্তে" বলিবেন না। তিনি হেদায়েতের তোহ্‌ফা নিয়া আসিয়াছিলেন এবং আকিদতের পুষ্প লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। (গ্রন্থকার) মীরজা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানীর মহাপ্রয়াণ শিক্ষণীয় নয়, এরূপ নহে। যাঁহারা ধর্ম্ম জগতে বা জ্ঞান জগতে যুগান্তর আনয়ন করেন, এইরূপ ব্যক্তিগণ সদাসর্ব্বদা পৃথিবীতে আসেন না।

* * *

(ক্রমশঃ)

হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) কথামৃত

(তোহফা গলোরভিয়া হইতে)

সঙ্কলন ও অনুবাদ : এ, এইচ এম, আলী আন্‌ওয়ার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"মসিহদ-দাজ্জালের অর্থ ইবলিসের খলিফা। কারণ দাজ্জাল 'ইবলিসের' নামগুলির মধ্যে একটি নাম মাত্র। ইহা তাহার 'ইস্‌মে আজম' বা প্রধান নাম। ইহার অর্থ সত্য গোপনকারী, মিথ্যাকে রূপ ও চমকদাতা, ধ্বংসের পথ সমূহ উদ্‌ঘাটনকারী, জীবনের পন্থাবলীকে আবরণে আচ্ছাদনকারী। শয়তানের প্রধানতম উদ্দেশ্যও এই। এই জন্য ইহা তাহার প্রধান নাম—ইস্‌মে আজম'। ইহার মোকাবিলায় আছে 'মসিহুল্‌ হাইউল্‌ কাইয়ুম'। ইহার অর্থ হাই ও কাইয়ুম খোদার খলিফা। 'আল্লাহু হাই ও কাইয়ুমু' খোদার সর্ব্ববাদী সম্মত 'ইস্‌মে আজম' বা শ্রেষ্ঠ নাম। ইহার অর্থ আধ্যাত্মিক ও দৈহিক প্রাণ-দাতা এবং উভয় প্রকার জীবনের অক্ষয় অব্যয় আশ্রয়, স্বয়ং স্থিতিবান, সকলকে নিজাকর্ষণে স্থিতিদাতা (সর্ব্বধারক) এবং আল্লাহ্‌ যিনি মাবুদ ও উপাস্য। অর্থাৎ, সেই সত্তা যাঁহাকে দেখা যায় না, যিনি যুক্তির অতীত, অতীত হইতে অতীত, গুপ্ত হইতে গুপ্ত, যাঁহার দিকে প্রত্যেক বস্তুই উপাসকরূপে অর্থাৎ প্রেম জনিত লয়ের অবস্থায় —যাহা যুক্তি ও জ্ঞান মূলক 'লয়,' কিম্বা প্রকৃত লয়ের অবস্থায়, যাহা হইল মৃত্যু—প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে যেমন সকলেই দেখিতে পায় যে এই বিশ্বের গঠন ও শৃঙ্খলা আপন ধর্ম্ম (বা বিশেষত্বকে) ছাড়ে না। অন্য কথায়, কোন হুকুমের পাবন্দ। এই আলোচনা হইতে দেদীপ্যমান হইয়া পড়ে যে খোদাতা'লার প্রধান নাম 'ইস্‌মে আজম' অর্থাৎ 'আল্লাহুল্‌-হাই-উল্‌-কাইয়ুমের' মোকাবিলা হইতেছে শয়তানের প্রধান নাম 'আদ্‌ দাজ্জাল' এবং খোদাতা'লা চাহিয়াছেন যে শেষ যুগে তাঁহার 'ইস্‌মে আজম' এবং শয়তানের ইস্‌মে আজমের একটি সংঘর্ষ হয় যেমন পূর্ব্বেও আদমের সৃষ্টির সময় এক সংঘর্ষ হইয়াছিল। সুতরাং, এক সময়ে যেমন খোদা শয়তানকে আইয়ুবের উপর শক্তি দিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি এই যুদ্ধের সময় ইসলামের উপর শয়তানকে ক্ষমতা দিয়াছেন এবং ইহাকে এই অনুমতি দিয়াছেন যে 'এখন তুমি তোমার সমস্ত বাহিনী সহ ইসলামের উপর নিঃসন্দেহে আক্রমণ কর'। ইহাতে শয়তান তাহার অভ্যাসানুযায়ী এক জাতিকে তাহার প্রতিরূপ করিয়াছে এবং ইসলামের উপর ভীষণ হামলা করিয়াছে। এদিকে খোদা তাঁহার ইস্‌মে আজমের প্রতীক করিয়াছেন এক ব্যক্তিকে। তাঁহাকে এক প্রকার 'লয়' বা 'ফানার' অবস্থা দিয়া আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন যাহাতে প্রকৃত এবাদতের দিক হইতে 'আল্‌-মাবুদের' (প্রকৃত উপাস্যের) সহিত তাঁহার সম্বন্ধ হয়। তাঁহার নাম রাখিয়াছেন 'আহ্‌মদ'। কারণ, সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ এবাদতের প্রকার হইল 'হাম্‌দ' (স্তুতি) যাহার জন্য স্রষ্টার গুণাবলীর পরম পরিচয় আবশ্যক এবং ঐশীগুণাবলীর পূর্ণ পরিচয় ব্যতীত পূর্ণ 'হাম্‌দ' সম্ভবপর নয়। (১৬৯—৭০ পৃঃ)

ইহা গবেষণার দ্বারা নির্ণীত হয় এবং ইহাই আমার ধর্ম্মমত যে প্রকৃতপক্ষে 'দাজ্জাল' শয়তানের 'ইস্‌মে আজম' বা প্রধান নাম। ইহা খোদাতা'লার 'ইস্‌মে আজম' (প্রধান নাম) 'আল্লাহুল হাই-উল-কাইয়ুমের' বিপরীতার্থক। এই গবেষণা হইতে প্রকাশ পায় যে প্রকৃতপক্ষে ইহুদীদিগকেও দাজ্জাল বলা যায় না এবং খৃষ্টান পাদ্রী বা অন্য কোন জাতিকেও বলা যায় না। কারণ তাহারা সকলেই আল্লাহ্‌র বিনীত ক্ষমতাহীন দাস। খোদা তাহাদিগকে তাঁহার মোকাবিলায় কোন ক্ষমতা দেন নাই। সুতরাং, কোনক্রমেই তাঁহাদের নাম 'দাজ্জাল' হইতে পারে না। অবশ্য শয়তানের উল্লিখিত নামের ইহারা বিকাশ। জগতের প্রারম্ভ হইতে এই সকল বিকাশ প্রকটিত হইতেছে। প্রথম বিকাশ

ছিল কাবিল। সে হজরত আদম আলাইহেস্ সালামের প্রথম পুত্র ছিল। সে তাহার ভাই হাবিলের কবুলিয়ত (খোদাতা'লার সন্তুষ্টিপ্রাপ্তি) দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হয় এবং এই ঈর্ষার ফলে একজন বেগুনাহের খুন দ্বারা হাত রঞ্জিত করে। শয়তানের শেষ প্রকাশের নাম 'দাজ্জাল'। ইহা তাহার চরম পূর্ণতম বিকাশ (প্রতীক)। ইহার দ্বারা সেই জাতিকে বুঝায়, যাহার সম্বন্ধে কোরআনের প্রথমেও উল্লেখ আছে এবং শেষেও আছে। অর্থাৎ 'জাল্লীনের' দল। তাহাদের কথা বলিবার পর সুরাহ্ ফাতেহা শেষ হইয়াছে এবং কোরআন শরীফের শেষ তিন সুরাহ্তেও তাহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।" (১৭০ পৃঃ)

"খান্নাস শয়তানের নাম সমূহের অন্যতম। অর্থাৎ শয়তান যখন সাপের স্বভাব নিয়া চলে এবং খোলাখুলিভাবে জোর জবরদস্তি করে না এবং আগাগোড়া চাল চক্র, প্রবঞ্চনা এবং সংশয় উপস্থিত করিবার দ্বারা চলে এবং দংশনের জন্য অতিশয় গোপন পথ ধরে, তখন তাহাকে 'খান্নাস' বলা হয়। হিব্রুতে তাহার নাম 'নাহ্হাশ'। তৌরাতের প্রারম্ভে লিখিত আছে যে 'নাহ্হাশ' হাওয়াকে প্রতারিত করিয়াছিল এবং 'হাওয়া' তাহার প্রতারণার ফলে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তখন আদমও খাইয়াছিলেন। সুতরাং সুরাতুন্ নাস্ হইতে জানা যায় যে 'নাহ্হাশ' আখেরী জামানাতেও প্রকাশ পাইবে। এই 'নাহ্হাশেরই' অপর নাম দাজ্জাল। সে-ই ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হজরত আদমের পদস্খলনের কারণ হইয়াছিল। তখন সে তাহার প্রবঞ্চনাকারিতায় কৃতকার্য্য হইয়াছিল এবং আদম পরাজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু খোদা চাহিয়াছেন ষষ্ঠ দিনের শেষ ভাগে আবার আদমকে সৃষ্টি করিয়া অর্থাৎ ষষ্ঠ সহস্রের শেষ ভাগে যেমন ইতিপূর্ব্বে ষষ্ঠ দিনে তিনি পয়দা হন—'নাহ্হাশের' মোকাবিলা তাঁহাকে দাঁড় করেন এবং এইবার 'নাহ্হাশ' পরাজিত হয় এবং আদম বিজয়ী হন। তাই, খোদা আদমের ন্যায় আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।" (১৭৪ পৃঃ টীকা) "আদমকে পরীক্ষা করা হইয়াছিল নাহ্হাশের দ্বারা। আরবীতে ইহাকে 'খান্নাস' বলা হয়। ইহার অপর নাম 'দাজ্জাল'। সেইরূপ শেষ আদমের মোকাবিলা নাহ্হাশের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাতে সে স্ত্রী স্বভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগকে অনন্ত জীবনের লালসা দেয়।" (১৭৫ পৃঃ পদ-টীকা)

"তৌরাত পাশ্চাত্য দেশগুলির কোন কোন জাতিকে ইয়াজুজ মাজুজ বলিয়া নির্দ্ধারণ করে। তাহাদের সময় মসিহ মাওউদের সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করে। কোরআন শরীফে এই জাতির জন্য একটি আলামত লিখিত আছে, "মিন্ কুল্লে হাদাবিইঁ ইয়ানসেলুন" অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার জাগতিক শ্রেষ্ঠত্ব তাহারা লাভ করিবে এবং সকল জাতিকেই তাহারা পরাস্ত করিবে। তারপর এই আলামতের দিকে ইশারা করা হইয়াছে যে তাহারা আগুনের কাজে বিশেষজ্ঞ হইবে। অর্থাৎ আগুনের দ্বারা তাহাদের কল-কব্জা চলিবে। অগ্নি ব্যবহারে তাঁহারা বড়ই ওস্তাদ হইবে। এই জন্যই তাহাদের নাম ইয়াজুজ মাজুজ। কারণ 'আজিজ' অগ্নি-শিখাকে বলা হয় এবং শয়তানের সত্তার সৃষ্টিও অগ্নি হইতে হইয়াছে, যেমন আয়েত 'খালাকতানী মিনান্ নার' হইতে প্রকাশ পাইতেছে। এই জন্য ইয়াজুজ মাজুজ জাতির সহিত তাহার একটি স্বভাবগত সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এই জন্য এই জাতি তাহার 'ইস্মে আজমে' বা প্রধান নামের প্রকাশার্থে এবং তাহার পূর্ণতম প্রতিরূপ হওয়ার যোগ্য। কিন্তু খোদার 'ইস্মে আজমের',—তাঁহার শ্রেষ্ঠতম নামের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ প্রকাশ এবং উহার পূর্ণতম প্রতিরূপ হইল 'আহ্মদ' নাম। ইহা এমন অস্তিত্বকে চাহিতেছিল, যিনি যুদ্ধ ও রক্তপাতের নামোচ্চরণ করিবেন না এবং পৃথিবীতে প্রেম ও শান্তি বিস্তার করিবেন।" (১৭৭ পৃঃ)

"ইয়াজুজ মাজুজের আভ্যন্তরীণ বিশেষত্ব হইল এই নামের উৎপত্তির কারণ। তাহা এই যে তাহাদের স্বভাবে আগ্নেয় উপাদান অধিক হইবে। এই জাতিরা অত্যন্ত গর্ব্ব করিবে এবং তাহাদের তেজস্বিতা স্ফূর্ত্তি ও চালাকীতে অগ্নি-ধর্ম্ম (অগ্নির গুণ ও বিশেষত্ব—সঃ আঃ) প্রকাশ পাইবে। তারপর, মৃত্তিকা উহার উৎকর্ষতার চরমে পৌঁছিলে উহার যথেষ্টাংশ জওহরে পরিণত হয় এবং উহাতে আগ্নেয় উপাদান বৃদ্ধি পায়। যেমন, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং অন্যান্য মলাবান প্রস্তর সমহ। সুতরাং এখানে কোরআনের আয়েতের অর্থ হইল ইয়াজুজ্ মাজুজের সৃষ্টিতে মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য (জওহর) সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যেমন, খনিজ পদার্থগুলিতে পূর্ণ উৎকর্ষতা থাকে! ইহা এ কথা প্রমাণিত করে যে, ভূমি উহার চরম বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছে এবং "ও আখ্রাজাতিল্ আরদু আস্কালাহা' আয়েত অনুসারে উহার শ্রেষ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুণ প্রকাশ করিয়াছে।" (২১৯ পৃঃ)

"ইয়াজুজ মাজুজের অস্তিত্ব একথা সম্পূর্ণাকারে প্রমাণিত করে যে, মানুষের মধ্যে যে সকল ভৌমিক শক্তি নিহিত আছে তাহা সমুদয়ই প্রকাশিত হইয়াছে। কারণ এই জাতির স্বভাবে পার্থিব গুণাবলীর উৎকর্ষতা সম্বন্ধে কাহারো কিছু বলিবার নাই। এই অন্তর্নিহিত কারণে খোদা তাহাদের নাম ইয়াজুজ মাজুজ রাখিয়াছেন। কারণ তাহাদের স্বভাবস্থ মৃত্তিকা উন্নতি করিতে করিতে যথেষ্ট পরিমাণ জাওয়াহেরাতের ন্যায় আগ্নেয় উপাদানের পূর্ণ উত্তরাধিকারী হইয়াছে। প্রকাশ্য কথা, মাটীর উন্নতি পরিশেষে ভূগর্ভজাত খনিতে যাইয়া শেষ হয়। অন্য কথায়, মৃত্তিকার শেষ উৎকর্ষতা হইল চরম উৎকর্ষতা প্রাপ্ত বস্তুকে অগ্নির নিকটবর্ত্তী করে। তারপর, জাতীয় আকর্ষণের ফলে অন্যান্য আগ্নেয় উপকরণ এবং গুণাবলীও এই সকল মানুষ প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ, আদম সন্তানের শেষ পরিণতি হইল বহু আগ্নেয় অংশ তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। এই উৎকর্ষতা ইয়াজুজ মাজুজের মধ্যে পাওয়া যায়। সংসার ও সাংসারিক চেষ্টা চরিতে যাহা কিছু আছে এবং এই জাতি পার্থিব জীবনের যতখানি শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে এবং পার্থিব জীবনকে উন্নত করিয়াছে, তার চেয়ে বেশী কেহ ধারণা করিতে পারে না। সুতরাং ইহাতে সন্দেহ জন্মিতে পারে না যে, মানুষের পার্থিব জীবনের সৌরভ-সার এখন ইয়াজুজ মাজুজ হইতে নির্গত হইতেছে। সুতরাং ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব এবং 'বরুজ' (পূর্ব্ববর্ত্তীদের গুণাবলী প্রতিবিম্বাকারে আগমন) এবং তাহাদের সমস্ত শক্তিগুলির উৎকর্ষতা একথার সাক্ষ্য যে মানব অস্তিত্বের যাবতীয় পার্থিব শক্তিগুলি প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং মানব প্রকৃতির বৃত্ত সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রতীক্ষিত অবস্থায় কিছুই বাকী নাই। সুতরাং, এই অবস্থার জন্য বরুজী পুনরাবির্ভাব জরুরী ছিল। এই জন্য ইস্লামী ধর্ম্ম-বিশ্বাসে এ কথাও প্রবেশ পাইয়াছে যে ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব, ঐশ্বর্য্য ও প্রাধান্যের পর পূর্ব্বকালীন অধিকাংশ সাধু পুরুষগণ বরুজীভাবে পুনরাগমন করিবেন। মোসলমানদের মধ্যে আহ্লে-সুন্নতের ন্যায় শিয়াদেরও এই ধর্ম্মমত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উভয় সম্প্রদায়ই ইহার প্রকৃত দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানে না। পুনরাবির্ভাবের প্রয়োজনের প্রকৃত রহস্য তো এই ছিল যে আদম সন্তান সৃষ্টির বৃত্তের পূর্ণাকার ধারণের সময়—ইহা হইতেছে ষষ্ঠ সহস্রের শেষ প্রান্ত—সৃষ্টির বিন্দুগুলি সেই দিকে উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী যে দিক হইতে সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। কারণ কোন বৃত্ত যে পর্য্যন্ত সেই বিন্দু পর্য্যন্ত না পৌঁছায় যাহা হইতে আরম্ভ কখনও আরম্ভ সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। বৃত্তের শেষাংশের প্রত্যাবর্ত্তন অপরিহার্য্য। কিন্তু এই রহস্যকে স্থূল বুদ্ধি ধরিতে পারে নাই এবং অযথা আল্লাহর বাক্যের বিরুদ্ধে এই বিশ্বাস গড়িয়া তুলিয়াছে, যেন সমস্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ভাল মন্দ ব্যক্তিগণ বাস্তবিকই পৃথিবীতে পুনর্ব্বার আসিবে। কিন্তু উপরোক্ত গবেষণা হইতে শুধু 'বরুজী পুনরাবির্ভাব'ই হইবে, প্রকৃত পুনরাবির্ভাব নয়। ইহা এই প্রকারে হওয়ার ছিল যে সেই 'নাহ্হাশ,' যাহার অন্য নাম হইল 'খান্নাস,' যাহাকে পার্থিব ধনভাণ্ডার সমূহ প্রদত্ত হইয়াছে, যে প্রথমে 'হাওয়ার' নিকট আসিয়া স্বীয় দাজ্জালিয়তের দ্বারা চির জীবন লাভের লালসা তাহাকে দিয়াছিল আবার বরুজীভাবে (গুণাবলীর পুনরাবির্ভাব স্বরূপে) শেষ যুগে প্রকাশ পাইবে এবং স্ত্রীলোকের স্বভাবাপন্ন স্বল্প-বুদ্ধি লোকদিগকে চিরজীবন লাভের লালসা দ্বারা এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিবে যে তাহারা তৌহীদ ছাড়িবে। কিন্তু খোদা আদমকে যেমন বেহেস্তে এই নসিহত করিয়াছিলেন 'তোমার জন্য সব ফলই হালাল, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটে যাইও না; ইহা হারাম, সেইরূপ খোদা কোরআনে বলেন, 'ও ইয়াগ্ফেরু মা দুনা জালেকা' —অর্থাৎ সকল গোনাহই ক্ষমা হইবে, কিন্তু খোদা শেরেক ক্ষমা করিবেন না। সুতরাং, শেরেকের নিকট যাইও না। ইহাকে নিষিদ্ধ বৃক্ষ জ্ঞান করিবে। সুতরাং এখন বরুজীভাবে সেই 'নাহ্হাশ্ই' যে 'হাওয়ার' নিকট উপস্থিত হইয়াছিল এ যুগে আত্ম-প্রকাশ করিয়া বলিতেছে যে এই নিষিদ্ধ বৃক্ষ খুব খাইবে—অনন্ত জীবন ইহাতেই আছে। সুতরাং আদিতে গোনাহ যেমন স্ত্রীলোক হইতে আসিয়াছিল, সেইরূপ আখেরী জামানায় স্ত্রীলোকের স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নাহ্হাশের কুমন্ত্রণায় ইহাকে গ্রহণ করিয়াছে।" (২২১)

সম্পাদকীয়

আহমদী প্রেস ও পত্রিকা

ভ্রাতৃগণ অবগত আছেন যে বহুদিন যাবত "আহমদী" পত্রিকা নিজস্ব "আহমদী প্রেসে" ছাপা হইতেছিল। কিন্তু এই "আহমদী প্রেস" ক্রয় করা উপলক্ষে ৭০০০৲ সাত হাজার টাকা কর্জ্জ করা হইয়াছিল। আমাদের এক ত্যাগশীল ভ্রাতা চট্টগ্রাম আঞ্জুমানের প্রেসিডেণ্ট জনাব সৈয়দ খাওয়াজা আহমদ সাহেব একাই তাঁহার এক খণ্ড জমি বিক্রয় করিয়া এই টাকা প্রাদেশিক আঞ্জুমানকে ধার দিয়াছিলেন। প্রাদেশিক আঞ্জুমান এই সাত হাজার টাকার মধ্যে এতাবৎ মাত্র ৩০০০৲ তিন হাজার টাকা প্রত্যার্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং তিনি তাঁহার অবশিষ্ট ৪০০০৲ চারি হাজার টাকা ফেরত চাহিয়াছেন অথবা প্রেসখানা যাবতীয় সরঞ্জামাদি সহ দাবী করিয়াছেন। জনাব প্রাদেশিক আমীর সাহেব প্রেস বাবত কর্জ্জ-কৃত অবশিষ্ট ৪০০০৲ টাকা পরিশোধ করিবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া অগত্যা সৈয়দ খাওয়াজা আহমদ সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন এবং কর্জ্জ পরিশোধার্থে প্রেসখানাই তাঁহাকে প্রত্যার্পণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তবে তিনি জমাতের ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট আপীল করিয়াছেন যে যদি কোন বন্ধু প্রাদেশিক আঞ্জুমানের ৪০০০৲ টাকা দেনা পরিশোধ করিয়া দেন, তবে প্রেসখানা আঞ্জুমানেরই থাকিবে এবং "আহমদী" পত্রিকাও নিজস্ব আহমদী প্রেসেই ছাপা হইতে থাকিবে।

দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে আমাদের কোন বন্ধু এই কার্য্যে অগ্রসর হইবেন কি না, তাহা বলা দুষ্কর। কিন্তু এই কার্য্য একদিকে যেমন বিরাট ত্যাগের পরিচয় হইবে, অপর দিকে বাজারে ছাপাখানার বর্ত্তমান চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই কথাও বলা যায় যে ইহাতে টাকা খাটাইলে লোকসানের কোন সম্ভাবনাও নাই। আর মাত্র ১০০০৲ খানেক টাকার টাইপ এবং অন্যান্য সরঞ্জাম হইলে এই আহমদী প্রেসে এক সঙ্গে ৯ নয় জন কম্পোজিটর কাজ করিতে পারিবে এবং উপযুক্ত পরিচালনায় ইহা বেশ লাভের ব্যবসায়ে পরিণতঃ হইতে পারে। বাজারে বর্ত্তমানে কাজের কোন অভাব নাই। আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন উপলক্ষে যে ভোটার লিষ্টি প্রস্তুত হইবে ইহাতে সরকারী মুদ্রণ কার্য্যের পরিমাণ করাই দুষ্কর। চেষ্টা করিলে প্রত্যেক প্রেসই এই বিরাট সরকারী কার্য্যের কোন না কোন অংশ পাইতে পারে। "আহমদী প্রেসের"ও এই দিক দিয়া বিরাট সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু জমাতের বন্ধুদের মধ্যে কে আছেন যিনি সাহস করিয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হইবেন এবং "হাম্ সুর্মা হাম্ সওয়াব" অর্থাৎ ইহ-পর কালের এই মহান পুণ্য কার্য্যে অগ্রসর হইবেন। যদি কেহ থাকেন তবে অতি শীঘ্র প্রাদেশিক আঞ্জুমানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া সর্ত্তাদি স্থির করিতে পারেন।

সময় অতি সঙ্কীর্ণ। যদি জমাতের বন্ধুগণ এই কার্য্যে অগ্রসর না হন তবে প্রাদেশিক আমীর সাহেব বাধ্য হইয়াই দেনার দায়ে উপরুক্ত ভ্রাতা সৈয়দ খাওয়াজা আহমদ সাহেবকে প্রেসখানা দিয়া দিবেন এবং সম্ভবতঃ সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ লাগাত এই কার্য্য হইয়া যাইবে।

সুতরাং "আহমদী" পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যা কখন প্রকাশ হয় তাহা বলা দুষ্কর। তজ্জন্য কোন নূতন প্রেস ঠিক করা ডিক্লায়েরাশন দেওয়া ইত্যাদি কার্য্যে কিছু সময় উত্তীর্ণ হইতে বাধ্য। কিন্তু বন্ধুগণ এবং "আহমদী"র গ্রাহক অনুগ্রাহক ও হিতাকাঙ্খীবর্গ বিনা দ্বিধায় এই সিদ্ধান্ত করিতে পারেন যে এই পত্রিকা খোদার মর্জি কখনও একেবারে বন্ধ হইবে না। এই পত্রিকার জীবনে বহু বিপর্য্যয় গিয়াছে। কিন্তু "ইসলাম জিন্দা হুতা হায় হর্ কারবালাকে বা'দ" এই প্রবাদ বাক্য অনুসারে প্রত্যেকবারই "আহমদী" পত্রিকা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর জাকযমকে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে! সুতরাং এখনও আমাদের এই ইমানই আছে যে বর্ত্তমানের প্রেস সংক্রান্ত বিপর্য্যয়ও "আহমদী" কাটাইয়া উঠিবে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইয়া ইহা আত্ম-প্রকাশ করিবে।

এই বিষয়ে "আহমদী" পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকাদেরও বিরাট দায়িত্ব রহিয়াছে। এই কথা সত্য যে "আহমদী" পত্রিকা প্রত্যেকের নিকট আহমদিয়তের পয়গাম লইয়া এবং সিলসিলার অন্যান্য জরুরী সংবাদ ও বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি সহ উপস্থিত হইতেছে। কিন্তু জমাতের বন্ধুগণ ইহার যে সামান্য বার্ষিক চাঁদা ৪৲ চারি টাকা তাহাও নিয়মিত আদায় করিতেছেন না। ভি, পি, প্রেরণ করিলেও অনেকে ফেরত দিয়া থাকেন। "আহমদী" পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ন্যূনপক্ষে ৫০০ পাঁচ শত হইবে। তাঁহারা যদি এই সময়ে তাঁহাদের দেয় চাঁদা দিয়া দিতেন তবে ইহাতেও অন্ততঃপক্ষে ২০০০৲ দুই হাজার টাকা জমা হইতে পারে। এই টাকা অবিলম্বে প্রাদেশিক অফিসে প্রেরিত হইলে ইহাতে দেনার এক অংশ আদায় হইয়া যাইত। "আহমদী"র গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণও তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করিবেন কি? নতুবা স্মরণ রাখিবেন যে "আহমদী প্রেস" হাত ছাড়া হইলে তাঁহাদেরও দায়িত্ব কম হইবে না। যদি সময় মত "আহমদী"র গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ তাঁহাদের এই সামান্য ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন করিতেন, তবে আজ "আহমদী" পত্রিকাকেও এই বিপদের সম্মুখীন হইতে হইত না। আপনারা অর্থাৎ জমাতের বন্ধুগণ আজ যদি চুপ করিয়া থাকেন, তবে "আহমদী প্রেস" হাত ছাড়া হইলে কেহই প্রাদেশিক আমীর বা প্রাদেশিক আঞ্জুমানের কর্ম্মকর্ত্তাদের উপর দোষারোপ করিতে পারিবেন না। কেননা, ইহা জমাতের কাজ। ইহাকে রক্ষা করা জমাতের সকল বন্ধুরই সমান কর্ত্তব্য। ব্যক্তি বিশেষ যত বড়ই হউন না কেন, এই কার্য্য করিতে পারে না।

অতএব আমরা আশা করি, জমাতের বন্ধুগণ অবিলম্বে এই কার্য্যে সাড়া দিবেন এবং "আহমদী প্রেস" যাহাতে হাত ছাড়া না হয়, তজ্জন্য পূর্ণ চেষ্টা করিবেন। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হইন। আমিন।

[সকল প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। পাক্ষিক আহমদীর নাম উল্লেখ করিয়া যে কেহ ইহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন]

Printed at the AHMADI PRESS and published by Mvi. Anwarul Haque
from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca.—Editor, Momtaj Ahmad, (Muballigh).